২. মৃত সৈনিকের মণিবন্ধে স্পন্দিত ঘড়ি

বাংলা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর ও আমাদের একজন শিক্ষক উদয়ন ঘোষ জানিয়েছিলেন তাঁর কাছে সাহিত্যচর্চা এক নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন। মানে, প্রকৃত শিল্পীর শিক্ষানবিশি চলতে থাকে আমৃত্যু, বিশেষজ্ঞে পরিণত সে হয় না।

আমরাও অনুরূপ ভাবি। যদিও ডিসকোর্স নির্মাণের সময়ে আমাদের পদ্ধতিটি আলাদা। অধুনা শিল্পসাহিত্যের যে ধরনের ওয়ার্কশপের কথা আমরা জানি — ঠিক ততটা ফর্মাল হয়ত নাও হতে পারে পদ্ধতিটা। কিন্তু ফর্মাল বা ইনফর্মাল যাই হোক, পদ্ধতিটা ওটাই, যদি ডিসকোর্সটিকে বহুস্বরাস্ত তথা পলিফোনিক হতে হয়। 'জারি বোবাযুদ্ধ'-এর লম্বা জার্নিতে আমরা এই পদ্ধতিকেই মান্যতা দিয়ে এসেছি বরাবর। যেমন আমাদের শিক্ষকদের (গীতা ঘটকের মতো ব্যতিক্রম বাদ দিলে যাঁরা বাংলা ভাষাচর্চার সঙ্গে যুক্ত) কারো কোনও নতুন উল্লেখযোগ্য লেখা প্রকাশ হলে সেটা জোগাড় করে পড়ে ফেলা (তখন আমরা দুজনেই আসানসোলে আর ইন্টারনেট, কম্পিউটার বা মোবাইলের তখনও এত জলচল হয়নি, এই লেখার জোগাড় করার ব্যাপারটা তখন রীতিমতো একটা পরিশ্রমসাধ্য কাজ ছিল) এবং আসানসোল থেকে কলকাতায় এসে (উদয়ন ঘোষের কর্মক্ষেত্র ছিল আসানসোল, তাঁর কাছে পৌঁছনোটা সহজতর ছিল— অবসর নেওয়ার পরে তিনি চলে আসেন কলকাতায় আর অমিয়ভূষণ থাকতেন কোচবিহারে। তিনি কলকাতায় এলে তবেই তাঁর সঙ্গে দেখা হত) লেখকদের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে একধরনের পারস্পরিক বিনিময়। প্রথমদিকে, মানে কম বয়সে এছাড়া আরও একটা পদ্ধতি ছিল— অনেক মাথা ঘামিয়ে তৈরি-করা জটিল প্রশ্নের লম্বা লিস্ট নিয়ে প্রিয় লেখকদের সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া। হ্যাঁ, মায়েস্ত্রোদের সস্নেহ প্রশ্রয়ও পেয়েছি, যাকে বলে, যথেষ্ট পরিমাণ। যদিও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকের ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন তৈরি হত সাক্ষাৎকার গ্রহণ হয়ে যাবার পর প্রদত্ত উত্তরের অভিঘাতে। প্রথমে 'কথা বলতে বলতে' ও পরে 'কথা যখন কথকতা' সাক্ষাৎকারমালাদুটি এই কালপর্বের অর্জন।

তো— এরকম একবারের কথা। তখন তুমুল বর্ষা, মেট্রো রেলের যে স্টেশনে আমাদের জোড়া লাগার কথা, সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে বৃষ্টি এল জোর ও দেখা গেল দুজনের কাছে সাকুল্যে একটিই ছাতা রয়েছে। এবং দুর্ভাগ্য কখনো সিংগুলার নাম্বারে আসে না বলে সেই উপর্ঝরণ বৃষ্টির মধ্যে একটি ছাতার আশ্রয় নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেখা গেল, যাঁর সঙ্গে কথা বলতে ২০৮টা তালগাছ পেরিয়ে এতদূর আসা, তিনি যাচ্ছেন জীবনানন্দ সভাঘরে, বক্তৃতা দিতে বা শুনতে, এতদিন পরে সে আর আমাদের মনে নেই।

পরে অনেকবারই তিনি আমাদের বলেছেন, দ্যাখো, যখনই হুইস্কির গ্লাসে দুটো গায়ে গায়ে জোড়া লেগে থাকা আইসকিউব দেখি, চুবড়ি-ভেজা তোমাদের দুজনের কথা মনে পড়ে আমার।

আর একবার মনস্থ করি আমাদের কাগজে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'দুই তীর' গল্পটির পুনর্মুদ্রণ করব। দুজনে মিলে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে গেছি তাঁকে গল্পটির একটি প্রাককথন লিখে দেবার অনুরোধ করতে।

'দেখুন আপনি ছাড়া দুই তীরের মতো অফবিট গল্পের ওপর আর কে লিখবে' বলি আমরা। সন্দীপন বলেন, 'কেন, তোমরা দুজনে লিখবে।' তাঁর কথা শুনে আমাদের অবস্থা হয়েছিল পঞ্চপাণ্ডবকে যখন কুন্তী পাঞ্চাল-রাজকন্যা দ্রৌপদীকে বিয়ে করতে বলেন তাদের মতো— একটা লেখা দুজনে লিখবে এ কখনো হয় না কি! কারোর কোনও সত্ব-স্বামীত্ব নেই এমন একটা লেখার কথা কি ভাবা যায়—!

সেবার সন্দীপন আমাদের অনুরোধ রেখে লেখাটা দেন, আর আমরা এই সম্পাদকীয় ডিসকোর্সটি লেখার একটা নতুন পদ্ধতি পেয়ে যাই— যেটাকে আমরা ওয়ার্কশপ-রাইটিং বলতে পারি। পদ্ধতিটি এরকম : আগের সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পরের সময় পর্বে আমাদের যা-কিছু আলোড়িত করেছে, সেই বিষয়গুলি নিয়ে একটা দীর্ঘ প্রলম্বিত আড্ডা চলতে থাকে অনেকটা ওয়ার্কশপের ধরনেই, এক অনিশ্চিত যাত্রা— বিভিন্ন লেখালেখি, নাটক, ফিল্মের টুকরো জড়ো হতে থাকে, যা অন্তিমে রূপ নেয় এই লেখাটিতে।

এখন যদি ফিরে দেখি, ১৯৮৯-এর রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ট্যাবলয়েড ফরমাটের একটি সংখ্যায় দেবেশ রায়ের একটি লেখার (পরিচয়, সমালোচনা সংখ্যা ১৯৮৭তে প্রকাশিত 'শিল্পের জনসংযোগ' শীর্ষক প্রবন্ধ) ওপর আলোচনা করা হয়েছিল। সেই লেখায় দেবেশ রায় থিওডোর ডবলিউ এ্যাডরনোর লেখা 'মিনিমা মোরালিয়া' বইটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ইয়োরোপের সমস্ত দার্শনিক মেথড আর জ্ঞান-তত্ত্বকে ধূলিসাৎ করে জার্মানিতে নাৎসিবাদ ক্ষমতায় এসেছিল। এর পর আর এনলাইটেনমেন্টের তত্ত্ব চলে না। এ্যাডরনোর কাছে তাই দর্শন কোনো 'মেথড' নয়। এক-একটি দার্শনিক প্রস্থান এক-একটি মেথডের সঙ্গে বাঁধা পড়ে দর্শনের মূল সংজ্ঞা নষ্ট করে ফেলে। তিনি দর্শনের এই মেথডেরই বিরুদ্ধে। তাই তাঁর দর্শন তিনি কোনো দার্শনিক বই লিখে প্রমাণ করেন না। তাঁর কাছে 'এসে' বা রচনাই হচ্ছে দর্শনের যোগ্য কাঠামো। এমন-কি আমরা যাকে আজকালকার ভাষায় 'রিভিয়ু' বলি, এ্যাডরনো মনে করেন সেগুলোই হচ্ছে দার্শনিক আলোচনার যথোচিত আধার। সেখানে হেতু-প্রত্যয়ের মূলে যাবার দায় নেই, সেখানে সিদ্ধান্তের কোনো দায়িত্ব নেই। একটা গান, বা ছবি, বা কবিতা, বা ভাস্কর্যের আলোচনায়— সমাজের ও ইতিহাসের সত্য উঠে আসতে পারে আর সেই সত্যই শিল্পের প্রকরণের সমস্যাকে চিনিয়ে দিতে পারে। এ-রকম আলোচনা যিনি করেন, তাঁকে ত নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরেই এগতে হবে আর সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ত কোনো একটি মাত্র মেথডে বাঁধা হতে পারে না। এ্যাডরনো তাই টুকরো-টুকরো লেখাই লিখে যেতেন।" পদ্ধতিটির মধ্যে আমাদের ওয়ার্কশপ-রাইটিং পদ্ধতিটিরও এক ধরনের সমর্থন খুঁজে পাই আমরা।

দেবেশ রায় বিষয়ে আমাদের আগ্রহ যদিও আরও আগের ঘটনা। জানুয়ারী ১৯৮৭ সংখ্যায় আমরা তাঁর 'মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' উপন্যাসটি নিয়ে একটি আলোচনা প্রকাশ করি। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রতিক্ষণ-এর ১৯৮৬-র শারদ সংখ্যায়। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' গ্রন্থে যদিও উপন্যাসটি অন্তর্ভুক্ত হয় তিস্তার শেষ পর্ব হিসেবে, আমরা আজও এটিকে স্বতন্ত্র উপন্যাসের মর্যাদা দিই।

দেবেশের কথা বলতে গেলে কেন যেন এক ইমেজারি ভেসে ওঠে যা মার্সেল প্রুস্ত প্রসঙ্গে জঁ ককতোর চিত্রকল্পের অনুরূপ : 'হিজ ওয়ার্ক কেপ্ট অন লিভিং, লাইক দ্য ওয়াচেস অন দা রিস্টস অফ ডেড সোলজারস'। দেবেশের ভাষায় যা নাকের ডগার বাস্তব, সেই সময়-চিহ্ন সর্বদাই দেবেশের লেখার শরীরে রয়ে গেছে।